কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১

সূরা ফজর

আল ফাজ্‌র কুরআনের ৮৯তম সূরা। আল ফাজ্‌র শব্দের অর্থ ভোর। আয়াত সংখ্যা ৩০। মক্কায় অবতীর্ণ।

নামকরণঃ

প্রথম শব্দ (الْفَجْرِ)কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়াযযমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ

এই সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
প্রথম ১৪টি আয়াতে পাঁচটি বিষয়ের (ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের) কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও যে আল্লাহ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তাঁর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে? এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামূদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছে।

সম্পদের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের মধ্যে কারু সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে না। বরং বান্দাকে সৎকাজের তাওফীক দান করাই হ'ল আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাকে সম্মানিত করা এবং এর বিপরীতটার অর্থ হ'ল তাকে অসম্মানিত করা । অতঃপর অকৃতজ্ঞ লোকদের চারটি মন্দ আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ১৫ থেকে ২০ আয়াতে।
শেষ দশ আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্মানিত ও অসম্মানিত ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে যাচাই হবে ক্বিয়ামতের দিন। যেদিন আল্লাহ সকলের সম্মুখে উপস্থিত হবেন এবং বান্দাকে তার কর্মের যথাযোগ্য প্রতিদান ও প্রতিফল দান করবেন

পূর্বের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আল গাশিয়াহতে পূণ্যবান ও পাপীদের প্রতিদান ও প্রতিফলের কথা বিকৃত হয়েছে আর সূরা ফজরে এমন সব কাজের কথার উল্লেখ রয়েছে যেগুলোর প্রতিফল শুধু শাস্তি। অবিশ্বাসী ও কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও আলোচিত হয়েছে।

সূরা আল ফজরে বেশীরভাগ অসৎকার্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সূরা আল বালাদে অধিকাংশ আলোচনা রয়েছে সৎকর্ম ও ভালোকাজের।

وَ الۡفَجۡرِ

১. শপথ ফজরের,

فَجۡرٌ অর্থ প্রভাতরশ্মি। শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সুবহে সাদেকের সময়। এখানে 'ফজর' কোন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

এক. প্রত্যেক দিনের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে।

দুই. এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকাল বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে কারো কারো মতে এর দ্বারা মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য; কারণ এ দিনটি ইসলামী চন্দ্র বছরের সূচনা। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল।

তিন. আবার কেউ বলেছেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফজরের সালাত ইত্যাদি।

অধিকাংশ তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে, ফজর শব্দ দ্বারা প্রতি দিনের সাধারণ ফজরকে বুঝানো হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট দিনের ফজর উদ্দেশ্য নয়।

'ফজর' যা দু'প্রকার : সুবহে কাযেব (মিথ্যা প্রভাত), যা অতি ভোরে পূর্বাকাশে সরু ও দীর্ঘ শুভ্ররেখা হিসাবে দেখা যায়। অতঃপর সুবহে সাদেক (সত্য প্রভাত), যা সুবহে কাযেব-এর পরে দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত হয়ে উদিত হয়। এটি মৌসুমভেদে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট পূর্বে হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে সুবহে সাদিক-এর শপথ করা হয়েছে।

وَلَيَالٍ عَشۡرٍ

২. শপথ দশ রাতের,

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদা ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] যা সর্বোত্তম দিন বলে বিভিন্ন হাদীসে স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে, "এদিনগুলোতে নেক আমল করার চেয়ে অন্য কোন নেক আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট এত উত্তম নয়, অর্থাৎ জ্বিলহজের দশ দিন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি"। [বুখারী: ৯৬৯, আবু দাউদ: ২৩৪৮, তিরমিযী: ৭৫৭]

তাছাড়া এই দশ দিনের তাফসীরে জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন, বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭] সুতরাং এখানে দশ রাত্রি বলে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীতে (وَأَتۡمَمۡنَاهَا بِعَشۡرٍ) বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের

এ দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে ‘জোড়’ ও ‘বিজোড়'। এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “বেজোড় এর অর্থ আরাফা দিবস (যিলহজ্বের নবম তারিখ) এবং জোড় এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহর (যিলহজ্বের দশম তারিখ)”। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে যাবতীয় সালাত আর বেজোড় বলে বিতর ও মাগরিবের সালাত বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।
তিনি বলেন, (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। [সূরা আন-নাবা: ৮] যথা: কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা। [ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে যেহেতু জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এর একটি তাফসীর এসেছে সেহেতু সে তাফসীরটি বেশী অগ্রগণ্য।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

৪. শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে-

রাত যখন আগত হয় এবং যখন বিদায় নেয়। কেননা, سَيَر(চলা) শব্দটি আসা যাওয়া উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। অন্য সূরায় ঠিক তেমনি শপথ করা হয়েছে সূরা মুদাসসিরের ৩৩ নং আয়াতে- وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে।

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

ذٰلك(এর) বলে উল্লিখিত যে সকল বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই সমস্ত বস্তুর কসম বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? প্রশ্নবোধকটি এখানে স্বীকৃতিসূচক। তাই বঙ্গানুবাদটিও করা হয়েছে সোজাসুজি। অর্থাৎ নিশ্চয় এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য শপথ। এখানে ‘ক্বসামুন’ অর্থ শপথ, কসম। এখানকার ‘তানভীন’টি শ্রেষ্ঠত্বার্থক। অর্থাৎ নিশ্চয় বর্ণিত বিষয়গুলোর শপথ বিরাট এক ব্যাপার। এমতো শপথই যথেষ্ট। আর কোনোকিছুর শপথের প্রয়োজন পড়ে না । কেননা যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করে শপথ করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো আল্লাহপাকের বিচিত্র শক্তিমত্তা ও অতুলনীয় গুণবত্তার পরিচায়ক।

حِجْرِএর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْرِএর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে।,

উপরোক্ত পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তাভাবনা করার জন্যে বলেছেন, “এতে কি বিবেকবানরা শপথ নেয়ার মত গুরুত্ব খুঁজে পায়? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফিলত থেকে

জাগ্রত করার একটি কৌশল। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের ওপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি আখেরাতে **হওয়া** তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-(এক) আদ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফিরআউন সম্প্রদায়।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

৬. আপনি দেখেননি আপনার রব কি (আচরণ) করেছিলেন আদ বংশের—

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক স্তম্ভসদৃশ আদ জাতির সাথে কি করে ছিলেন? কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? তারা ছিল হঠকারী এবং অহংকারী। তারা আল্লাহর নাফরমানী করতো। রাসূলকে অবিশ্বাস করতো এবং নিজেদেরকে নানা প্রকারের পাপকর্মে নিমজ্জিত রাখতো। তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হযরত হূদ (আঃ) আগমন করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ক্রমাগত সাত রাত্র ও আট দিন পর্যন্ত ঐ সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে আদ সম্প্রদায়ের সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের একজনও ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পায়নি। মাথা ও দেহ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছিল। কুরআনের মধ্যে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সূরা আল হাককাহতেও এর বর্ণনা রয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা; যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা সেথায় লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। অতঃপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?" (সূরা আল-হাক্কাহ :৬-৮)

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?

'ইরাম' একটি গোত্রের নাম। আবার বলা হয় إِرَمَ আদ জাতির পিতামহের নাম।

এখানে প্রথম আদ (আদেউলা) এর কথা বলা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আদ আসের, আস্ ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুত্র। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আদ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামুদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব. আদ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামূদ আবেরের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আদের সাথে ইরামকে যুক্ত করার কারণ এই যে, আদ বংশের দুটি স্তর রয়েছে– পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আদ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, এখানে প্রথম আদ বোঝানো হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আদের তুলনায় আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে عاد إرام 'আদে-ইরাম' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সূরা আন-নাজমে (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ذَاتِ الْعِمَادِ মূলত عِمَاد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের(ذَاتِ الْعِمَادِ) বলা হয়েছে। অপর কারো কারো মতে তারা যেহেতু অট্টালিকায় বাস করত সেহেতু তাদেরকে(ذَاتِ الْعِمَادِ) বলা হয়েছে। কারণ অট্টালিকা নির্মাণ করতে স্তম্ভ নির্মানের প্রয়োজন হয়। তারা সর্বপ্রথম এ জাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করে। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: হূদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, "তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উচু জায়গায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছে এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছে, যেন তোমনা চিরকাল এখানে থাকবে।" [সূরা আশ শু'আরা: ১২৮-১২৯] অন্য আয়াতে আছে, (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ) "আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদ বাসের জন্য। [সূরা আল-হিজর: ৮২]

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

৮. যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি

আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন।" [সূরা আল আরাফঃ ৬৯] আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেছেন, "আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে, কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী? [সূরা হা-মীম আস সাজদাহঃ ১৫] আরও বলেছেন, "আর তোমরা যখন কারো ওপর হাত উঠিয়েছে প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।" [সূরা আশ শু'আরাঃ ১৩০]

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

৯. এবং সামূদের প্রতি? -যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল;

উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। এরা স্বালেহ (আঃ)-এর জাতি ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাথর খোদাই কাজের বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।" [সূরা শুআরা ১৪৯]

সামূদ' গোত্র হল 'ইরম' বংশের অন্যতম শাখা। 'আদ ও সামূদ উভয় গোত্রের মূল দাদা হলেন 'ইরম'। ইরমের বংশধররা আম্মান ও হাযারামাউত এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর' । সামুদ জাতি জাতি পাহাড়ের ভেতর খোদাই করে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করতো, এজন্য তাদেরকে 'আসহাবুল হিজর' সম্বোধন করা হয়েছে। আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় শাম হতে মক্কার পথে অবস্থিত এই শহরকে এখন 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়।

হিজরী ৯ম সনে তাবূক যুদ্ধে যাবার পথে মুসলিম বাহিনী যখন 'হিজর' এলাকা অতিক্রম করে, যা ছিল খায়বরের অদূরে 'ওয়াদিল ক্বোরা' এলাকায় অবস্থিত এবং এটাই ছিল ছামূদ জাতির গযবের এলাকা। তখন রসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত কোন জাতির অঞ্চল হয়ে অতিক্রম করার সময় কাঁদতে কাঁদতে অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চাইতে চাইতে অতিক্রম কর। (বুখারীঃ নামায অধ্যায়, মুসলিম যুহদ অধ্যায়)

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

১০. এবং কীলকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি?

أَوْتَاد শব্দটি وتد এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফিরআউনের জন্য 'যুল আউতাদ'। (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। ফিরআউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। কারও কারও মতে এর দ্বারা যুলুম নিপীড়ন বোঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ, ফিরআউন যার উপর ক্রোধান্বিত হত, তার হাত-পা চারটি পেরেকে বেঁধে অথবা চার হাত পায়ে পেরেক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে রাখত। বা কোন গাছের সাথে পেরেক মেরে রাখত। অথবা পেরেক মেরে দেহের উপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে তার সেনাবাহিনীকেই কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাছাড়া এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাবু গাড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। কারও কারও মতে, এর দ্বারা ফিরআউনের প্রাসাদ-অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। এসবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ফিরআউন মূলত: এসবেরই অধিকারী ছিল। [ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

১২. অতঃপর সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

আদ, সামূদ ও ফেরাঊন স্ব স্ব অঞ্চলে সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

১৩. ফলে আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

سَوْطَ عَذَابٍ অর্থ نصيب عذاب 'শাস্তির অংশ। এর দ্বারা শাস্তির কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। কেননা السوط শব্দ দ্বারা আরবদের নিকটে কঠোরতম শাস্তিকে বুঝানো হয়। আরবরা একথাটি সকল প্রকার কঠোরতম শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ প্রেরিত প্রতিটি শাস্তিই سوط عذاب বা শাস্তির কশাঘাত। [তাফসীরে কুরতুবী] উক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের উপরে ইতিহাসের কঠোরতম শাস্তিই নাযিল হয়েছিল। 'আদ ও সামূদ জাতি যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এবং প্রচন্ড নিনাদসহ ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ফেরাঊন তেমনি তার সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকরসহ চোখের নিমিষে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। অন্যদিকে মজলুম বনু ইসরাঈলগণ মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে মুক্তি পেয়েছিল [সূরা বাক্বারাহ ৪৯-৫০; সূরা ইউনুস ৯০-৯২]।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

১৪. নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

এখানে مرصد ও مرصاد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যাকোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্ক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হীন করেছেন।

পরপর বর্ণিত দু'টি আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয়া সম্মান ও অসম্মান, সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা আল্লাহর নিকটে কারো প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার নিদর্শন নয়। বরং সবকিছু হয়ে থাকে বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর ফায়ছালা ও তাঁর পূর্ব নির্ধারণ (قضاء وقدر) অনুযায়ী। প্রকৃত মুমিন বান্দা সচ্ছল ও অসচ্ছল, কষ্ট ও আনন্দ উভয় অবস্থায় সবর করে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয় — এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। দুই. আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব- অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 'আমি আশ্চর্য হই মুমিনের উপর যখন তার কল্যাণ লাভ হয়, তখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও শুকরিয়া আদায় করে। আবার যখন সে কষ্টে পতিত হয়, তখনও সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও সবর করে। [আহমাদ- ১৪৯২, মিশকাত-৭৩৩]। অন্য হাদীসে এসেছে, 'মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার সকল কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারটা এরূপ নয়। তার জন্যে আনন্দের কিছু ঘটলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। এতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'। (মুসলিম- ২৯৯৯)। বরং এসবই আল্লাহর পরীক্ষা মাত্র। যেমন তিনি বলেন, 'তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমল করে সেটা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' [মুলক ২]।

অতএব ধনিক ও শাসকশ্রেণী যেন অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা না ভাবে যে, এসবকিছুই তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র এবং তারা অবশ্যই আল্লাহর বিশেষ প্রিয়পাত্র। এদেরকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, 'তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি'। 'আর আমরা তাদের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা (আসল তাৎপর্য) বুঝে না' (মুমিনূন ৫৫-৫৬)। পক্ষান্তরে ঈমানদার বান্দাগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু কিছু ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। তবে তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের'। 'যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হ'লে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই নিকটে ফিরে যাব' (সূরা বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৬)।

অতএব দুনিয়াতে কাউকে সম্মানিত করার অর্থ আল্লাহর নিকটে তার সম্মানিত হওয়া নয় এবং দুনিয়ায় কাউকে অসম্মানিত করার অর্থ আল্লাহর নিকটে তার অসম্মানিত হওয়া নয়। বরং উভয় অবস্থায় আল্লাহর নিকটে সম্মানিত হওয়ার মানদন্ড হ'ল আল্লাহভীরুতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। কখনো সম্মানিত কখনো অসম্মানিত করে, কখনো সচ্ছল কখনো অসচ্ছল করে আল্লাহ তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের উপরে টিকে থাকে কি-না। এক্ষণে পরীক্ষায় ভীত হয়ে যদি সে শয়তানের ফাঁদে পা না দেয় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় থাকে, তবে তার সম্পর্কে আল্লাহর সুসংবাদ হল, 'তারা হল ঐ সকল ব্যক্তি যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত আশীষ ও অনুগ্রহ রয়েছে এবং এরাই হল সুপথপ্রাপ্ত' [সূরা বাক্বারাহ ১৫৭]।

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

১৭. কখনো নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

كَلَّا শব্দটি 'প্রত্যাখ্যানকারী অব্যয়'। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ সৎ ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয়। বিষয়টিকে পরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, كَلَّا 'কখনোই এরূপ নয়'। দু'টি ভাবনার কোনটাই সঠিক নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। কোন কোন নবী-রাসূল কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন আবার কোনও কোনও আল্লাহদ্রোহী আরাম-আয়েশ্যে জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছেন।

মানুষের উক্ত ভুল চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করার পর এক্ষণে আল্লাহ অকৃতজ্ঞ লোকদের চারটি বদভ্যাসের কথা উল্লেখ করছেন। যার প্রথমটি হল এই যে, তারা ইয়াতীমকে সম্মান করে না। তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয় ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে। নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দোকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জন্নাতে আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এভাবে থাকবে" এটা বলে তিনি তার মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলদ্বয় একসাথ করে দেখালেন। [বুখারী: ৬০০৫]

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

১৮. এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

এটা হল কাফেরদের দ্বিতীয় বদভ্যাস। তারা নিজেরা তো মিসকীনদের খাদ্য দান করে না। এমনকি অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। এর মধ্যে ধনীদের প্রতি যেমন দান করার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রতিও নির্দেশ রয়েছে, যেন তারা সক্ষম ব্যক্তিদেরকে এব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল

এটি হল কাফিরদের তৃতীয় বদভ্যাস। তারা তাদের বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিতে হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করে দু'হাতে ভোগদখল করে। দুর্বল ওয়ারিছদের তারা সাধ্যমত বঞ্চিত করে। আরবরা নারী ও শিশুদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিত না। কারণ তারা যুদ্ধ করতে পারত না এবং যুদ্ধে পরাজিত হলে তারা বিজয়ীদের দখলে চলে যেত।

বস্ত্ততঃ দুর্বল শরীককে ফাঁকি দেওয়ার এ বদভ্যাস কেবল সে যুগের কাফিরদের মধ্যে ছিল না, এযুগের কাফের ও মুসলমান ফাসেকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কারু এক বিঘত যমীন অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে'। (বুখারী-৩১৯৮, মুসলিম-১৬১০)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জমি দখল করল, তাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা বহন করে চলতে বাধ্য করা হবে'। (আহমাদ-১৭৫৯৪, ১৭৬০৫) অতঃপর এই মীরাস যদি ইয়াতীমের হয়, তাহলে তার অন্যায় ভোগ-দখল হবে আরো বেশী মারাত্মক।

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালবাস

কাফেরদের ৪র্থ বদভ্যাস হল সীমাহীন ধনলিপ্সা। তারা যত পায়, তত চায়। তাদের চাহিদার শেষ থাকে না। جَمًّا শব্দটি كثير বা অত্যধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। প্রাচুর্যের লালসা তাদেরকে এমন বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা সম্পদ থাকা-না থাকাই সম্মানের কারণ হিসাবে বিবেচনা করছে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আদম সন্তানের যদি একটি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তাহলে তারা চাইবে যদি এরূপ দুটি স্বর্ণের পাহাড় হত। মূলত তাদের মুখ মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারবে না। (সহীহ বুখারী- ৬৪৩৯)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

২১. কখনো নয়। যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে,

কাফিরদের চারটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

دَكًّا এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে। যখন ভূকম্পনের মত হয় সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে; তখন কার কি অবস্থা হবে একটু চিন্তা করা দরকার। যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি অস্বীকার করে তোমরা এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করেছো সেটি কোন অসম্ভব ও কাল্পনিক ব্যাপার নয়। বরং সে বিষয়টি অবশ্যি সংঘটিত হবে। সামনের দিকে সেটি কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

২২. আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও

মূলে বলা হয়েছে(وَجَاءَ رَبُّكَ) এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "আপনার রব আসবেন।" এখানে 'হাশরের মাঠে আল্লাহর আগমন' সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই হাশরের মাঠে বিচার ফয়সালা করার জন্য স্বয়ং আসবেন। আল্লাহ তা'আলা হাশরের মাঠে আগমন করবেন এটা সত্য। যেভাবে আসা তাঁর জন্য উপযুক্ত তিনি সেভাবে আসবেন। এই আগমনের অর্থ আমরা বুঝি কিন্তু তিনি কিভাবে আগমন করবেন তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

কিয়ামতের দিন যখন ফিরিশতাগণ আসমান হতে নিচে অবতরণ করবেন, তখন প্রত্যেক আসমানের ফিরিশতাদের আলাদা আলাদা কাতার বা সারি হবে। এইরূপ সাতটি কাতার হবে যাঁরা সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে নেবে।

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে বা সামনে উপস্থিত করা হবে। হাদীসে এসেছে, "জাহান্নামকে ফেরেশতারা টেনে নিয়ে আসবে, সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে।" [মুসলিম: ২৮৪২, তিরমিযী: ২৫৭৩]

জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে উপস্থিত করা হবে। তা দেখে সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও আম্বিয়া ('আলাইহিমুস সালাম)-গণ হাঁটু গেড়ে লুটিয়ে পড়বেন। আর 'ইয়া রাব্ব! নাফসী নাফসী' বলতে থাকবেন। [ফাতহুল ক্বাদীর]

يَتَذَكَّرُ -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. يَتَذَكَّرُ -এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। সুতরাং সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ? (ফাতহুল কাদীর) দুই. অথবা يَتَذَكَّرُ -অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা

কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। [ইবনে কাসীর]

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

২৪. সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?

এই সময় কাফের ও পাপী মানুষ কেবলই অনুতাপ করবে, আর বলবে হায়! দুনিয়ায় থাকতে যদি দৃঢ় বিশ্বাস করতাম ও সে অনুযায়ী নেক আমল করতাম, তাহলে আজ তার সুফল পেতাম। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসী কাফেরও দুনিয়াতে অনেক সময় সৎকর্ম করে থাকে। কিন্তু তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। কারণ সে তো আল্লাহকেই বিশ্বাস করত না। তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করতো না। তাঁর প্রেরিত ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত না। অতএব সে কিভাবে আল্লাহর রহমত পেতে পারে? ফলে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তার কোন সৎকর্ম ঐদিন কবুল করা হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : "জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!" (সূরা ফুরকান ২৭)

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না,

ক্বিয়ামতের দিন অবাধ্যদের শাস্তি আল্লাহ যেভাবে দিবেন, তার চাইতে কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারু নেই। কেননা দুনিয়ার যেকোন কঠোরতম শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। এখানে عذاب অর্থ تعذيب 'কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আমার বান্দাদের সংবাদ দাও যে, নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'এবং আমার শাস্তিও অতীব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' (হিজর ৪৯-৫০)।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

২৬. এবং তার বাঁধার মত বাঁধতে কেউ পারবে না।

এই জন্য যে, সেদিন সমস্ত প্রকার ইচ্ছা ও এখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে হবে। অন্য কারো তাঁর সামনে কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সুপারিশ পর্যন্তও করতে পারবে না। এই অবস্থায় কাফেরদের যে আযাব হবে এবং যেভাবে তারা আল্লাহর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, তার কল্পনাও করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়; তা অনুমান করা তো দূরের কথা। এ অবস্থা তো যালেম ও অপরাধীদের হবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; যেমন পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!

পূর্বের আয়াতগুলিতে (২৩-২৬) অবিশ্বাসী কাফের-মুনাফিকদের কঠিন শাস্তির বর্ণনা শেষে এবার (২৭-৩০ আয়াতে) প্রকৃত বিশ্বাসী মুমিন নর-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে মুমিনদের হৃদয়কে 'নফসে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

‘প্রশান্ত আত্মা’ বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা-শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দ্বীন এনেছিলেন তাকে নিজের দ্বীন ও জীবন বিধান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দ্বীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য-প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্বিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দ্বীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে ‘শারহে সদর’ বা হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল আন’আম, ১২৫)

উল্লেখ্য যে, ‘নফস’ তিন প্রকার। এক- নফসে মুত্বমাইন্নাহ- প্রশান্ত হৃদয়। দুই- নফসে লাউয়ামাহ- তিরষ্কারকারী আত্মা অর্থাৎ বিবেক এবং তিন- নফসে আম্মারাহ অর্থাৎ অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর। শেষোক্ত অন্তরটি সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে। এর সঙ্গে সর্বদা লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়। বান্দাকে তাই সর্বদা এমন পরিবেশে থাকতে হয় যাতে নফসে আম্মারাহ উত্তপ্ত হতে না পারে।

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

২৮. তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ– অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু’মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরসের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

‘আন-নাফসুল মুতমায়িন্নাহ’ - আত্মা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,

প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা নেককার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ কারণেই সুলাইমান আলাইহিস সালাম

দোআ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন।” [সূরা আন-নামল: ১৯]

অনুরূপভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামও দো'আ করতে গিয়ে বলেছিলেন, “আর আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন” [সূরা ইউসুফ: ১০১] এমনকি ইবরাহীম আলাইহিস সালামও দোআ করে বলেছিলেন, “হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন”। [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৩] এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহা নেয়ামত, যা নবী-রাসূলগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِي جَنَّتِ

৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

এখানে ‘আমার জান্নাত’ বলা হয়েছে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। কেননা এটা কেবল একটি শান্তির বাগিচা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত মু’মিনগণকে আল্লাহ্ তা’আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ, পূর্বোল্লিখিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু’মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেনঃ এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেন: উভয় সময়েই মু’মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: যখন মু’মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اخرجي راضيه مرضيه الى روح الله وريحان الله অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট–এমতাবস্থায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। আল্লাহ্ রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি পাঠ করলাম।

হযরত আবু বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ । এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে। (ইবনে কাসীর)

ফুটনোট

▣ ১৪টি আয়াতে ৫টি বিষয়ের (ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের) কসম করা হয়েছে।

▣ 'ফজর' যা দু'প্রকার : সুবহে কাযেব (মিথ্যা প্রভাত), সুবহে সাদেক (সত্য প্রভাত)।

▣ শপথের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন (যিলহজ্বের দশ দিন), বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন (যিলহজ্বের নয় তারিখ) আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন (যিলহজ্বের দশ তারিখ) ।

▣ এ সূরায় তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-(এক) আদ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফিরআউন সম্প্রদায়।

▣ 'ইরাম'একটি গোত্রের নাম। আবার বলা হয় إِرَمَ আদ জাতির পিতামহের নাম।

▣ আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

▣ সামূদ' গোত্র হল 'ইরম' বংশের অন্যতম শাখা। 'আদ ও সামূদ উভয় গোত্রের মূল দাদা হলেন 'ইরম'।

▣ সূরায় উল্লেখিত উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। এরা স্বালেহ (আঃ)-এর জাতি ছিল।

▣ ইরমের বংশধররা আম্মান ও হাযারামাউত এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর'। সামুদ জাতি জাতি পাহাড়ের ভেতর খোদাই করে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করতো, এজন্য তাদেরকে 'আসহাবুল হিজর' সম্বোধন করা হয়েছে। আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় শাম হতে মক্কার পথে অবস্থিত এই শহরকে এখন 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়।

▣ ফিরআউনকে 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

▣ 'আদ ও সামূদ জাতি যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এবং প্রচন্ড নিনাদসহ ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ফেরাঊন তেমনি তার সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকরসহ চোখের নিমিষে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল।

▣ ১৫-১৬ নং আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয়া সম্মান ও অসম্মান, সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা আল্লাহর নিকটে কারো প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার নিদর্শন নয়। বরং সবকিছু হয়ে থাকে বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর ফায়ছালা ও তাঁর পূর্ব নির্ধারণ (قضاء وقدر) অনুযায়ী। প্রকৃত মুমিন বান্দা সচ্ছল ও অসচ্ছল, কষ্ট ও আনন্দ উভয় অবস্থায় সবর করে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

▣ ১৭-২০ নং আয়াতে কাফিরদের চারটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা-

- ইয়াতীমকে সম্মান না করা,
- মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত না করা,
- উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলা,
- সীমাহীন ধনলিপ্সা।

▣كَلَّا كَلَّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

▣ পূর্বের আয়াতগুলিতে (২৩-২৬) অবিশ্বাসী কাফের-মুনাফিকদের কঠিন শাস্তির বর্ণনা শেষে এবার (২৭-৩০ আয়াতে) প্রকৃত বিশ্বাসী মুমিন নর-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

▣ মুমিনদের হৃদয়কে 'নফসে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

▣ 'নফস' তিন প্রকার। এক- নফসে মুত্বমাইন্নাহ- প্রশান্ত হৃদয়। দুই- নফসে লাউয়ামাহ- তিরষ্কারকারী আত্মা অর্থাৎ বিবেক এবং তিন- নফসে আম্মারাহ অর্থাৎ অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর।

▣ প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। 'আমার জান্নাত' বলা হয়েছে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। কেননা এটা কেবল একটি শান্তির বাগিচা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থল।